International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.11-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.002

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের আচার-আচরণের প্রকৃতি ও ব্যবহারিক উপযোগিতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

উৎপল বিশ্বাস
গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, ভারত

Received: 19.10.2024; Accepted: 28.10.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Rituals in folk religion often serve practical purposes that extend beyond their symbolic or spiritual dimensions. This abstract examines how these rituals function within community contexts to address everyday needs and reinforce social cohesion. Folk religious practices frequently integrate practical actions such as agricultural rites, health-related rituals, and rites of passage, which are designed to manage natural and social challenges. For example, fertility rituals may enhance agricultural productivity, while healing ceremonies can offer psychosocial support in times of illness. Furthermore, these rituals help to uphold cultural values and norms, reinforcing social bonds and communal identity. By analyzing the intersection of ritual practices and practical utility, this study highlights how folk religion serves as a functional framework for addressing the practical concerns of individuals and communities, thereby sustaining cultural continuity and social harmony.

Keywords: **Folk Religion, Practical Utility, Rituals, Agricultural Rites, Health Management, Social Cohesion, Cultural Continuity, Community Bonds.**

ভূমিকা: সমাজ জীবনে মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, মানুষ তার নিজের চেয়ে বড় কোনো সত্তা বা সত্যকে খুব সহজে প্রাধান্য দিতে চায় না এবং স্বীকার করে না। মানুষ কেবলমাত্র তখনই নিজের সত্তার বাইরে বড় কোন সত্য বা সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়, যখন সে কোন পার্থিব বা কল্পিত সংকট বা সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে তার নিজের শক্তির সীমারেখা এবং নিজস্ব বৌদ্ধিক কৌশলের বিস্তরপরিসরে সেই পার্থিব বা কল্পিত সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পায় না, তখনই আত্মশক্তি অলৌকিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়, আর সেখানেই মানব সমাজে ধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্মের যতই বিচিত্র রূপ ও আচার-আচরণ বিদ্যমান থাকুক না কেন ধর্মের উৎস সমাজ জীবনে মানুষের সংগ্রামের বিবিধ সমস্যাপূর্ণ পরিবেশে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের মধ্যে। সমাজবদ্ধ মানুষ নিজের

অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক পরিবেশকে নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করে, আবার সামাজিক পরিবেশকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে কতগুলি সামাজিক কলাকৌশলকে আয়ত্ত করতে হয়। সামাজিক কলাকৌশল গুলির মধ্যে খাদ্য উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন পদ্ধতি যেমন সম্পৃক্ত রয়েছে, তেমনি সামাজিক নীতি, বিধিনিষেধ, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাসও তার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। সমাজের এই কলাকৌশল গুলি সমাজ কাঠামোকে স্থায়িত্ব প্রদান করে এবং গোষ্ঠী জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে সমাজের এই কলাকৌশল যদি দুর্বল হয়, সমাজস্থ মানুষের কাছে এগুলি আয়ত্ত করার সুযোগ ও সম্ভাবনা কম থাকে তাহলে সমাজ জীবনে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়। আর সমস্যায় জর্জরিত মানুষ সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য অতিমানবিক শক্তি ও বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। আর তখনই সমাজে বিচিত্র দেবতার আবির্ভাব হয় এবং মানুষের কল্পনার আকাশে দেবতারা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর উত্তর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকগণ ধর্ম, দেবতা এবং তার বৈচিত্র্যপূর্ণ নানান আচার-আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন-ভিন্ন সমাজে অনুসন্ধান করেছেন এবং সকলেই প্রায় শেষ পর্যন্ত একি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত Raymond Firth (1971), তার Element of Social Organization শীর্ষক গ্রন্থে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন ধর্ম হলো মৌলিক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার প্রত্যয়রূপ ও অভিক্ষেপ। সমাধান বিশেষত আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ দৈহিক ও মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাই। মানুষের মনের প্রধান উপাদান হল প্রতিকী ও মানবকেন্দ্রিক যেমন পরলোকে বিশ্বাস মানুষের বেঁচে থাকার বাসনার অভিপ্রায় ঘটায়, তেমনি পুনর্জন্মের বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তি সত্তার অবিনশ্বরতাকেই প্রকাশ করে। বিচিত্র সব দেব-দেবীর ধারণার উৎপত্তি হয় মানবিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকারশক্তি আয়ত্ত করার অভিপ্রায় থেকে। মানুষের অজ্ঞানতা থেকে ঈশ্বরের ধারণা ও জ্ঞান গড়ে ওঠে, যে সমাজ ব্যবস্থায় এই অজ্ঞতা যত গভীর সেই সমাজে দেবদেবীর রহস্য ও গভীরতা ততই বিচিত্র। সমাজ জীবনে মানুষ যখন মানুষের কাছে সামান্য মানবিক ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন দেবতার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বাড়ে। মানুষ আমাকে পছন্দ ও ভালো না বাসলেও দেবতা আমাকে ভালবাসে এবং আমার দুঃখ কষ্টে দেবতা আমাকে সান্তনা দেন এই ধারণা ও অনুভূতি বঞ্চিত মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায়, এগুলি ছাড়া মানুষ সামাজিক জীবনে নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেনা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো ভালবাসাও মানুষের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। বিদ্বেষ-বৈষম্য জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যখন মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসার মতো মৌলিক চাহিদা পায় না, তখন হতভাগার মত করুন দৃষ্টিতে দেবতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সেই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তা সেই একদেবতা বিশ্বাসী ধর্মইহোক (Monotheistic Religion) আর বহুদেবতা বিশ্বাসী ধর্মইহোক (Polytheistic Religion). প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস, দেবতা ও পূজা-অর্চনার নানান আচার-আচরণ এই বেদনা ও ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি আধ্যাত্ম্যলোকের কুয়াশা ও রহস্য কিছুটা ভেদ করতে পারলেও সম্পূর্ণটা পারেনি। ভয়, বিস্ময়, অজ্ঞানতা এগুলি যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসকে গড়ে তুলতে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে তেমনি বেদনা, দুঃখ, নৈরাশ্য উদাসীনতা ধর্মীয় বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন

করছে। মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব মানুষের একেবারে নিভৃততম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়টিও যে একেবারে সামাজিক সম্পর্কের বাইরে নয়। আমাদের সমাজে বিদ্যমান স্তরবিভাজনে যদি ফাঁক থাকে, সেই ফাঁক যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেই ফাঁক দিয়ে ভেদাভেদ, বৈষম্য, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, মনোমালিন্যতা সমাজদেহ অনবরত প্রবেশ করে তাহলে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা ও আধুনিক প্রযুক্তনির্ভর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও মানুষের বেদনা, হতাশা, দুঃখ, বিষণ্ণতা দূর করতে পারবেনা, আর তখনই মানুষ সান্তনার একটি আশ্রয় খুঁজে থাকে, আর ধর্ম সেই আশ্রয় মানুষকে প্রদান করে, তা অতি উন্নত সমাজের শাস্ত্রীয় ধর্মই হোক আর অনুন্নত সমাজের লোকধর্মই হোক।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের প্রকৃতি ও স্বরূপ: মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকধর্মের প্রকৃতি ও সরুপ এই জেলার বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। লোকধর্মের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে প্রধান যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেটি হলো তার স্বীকৃতি, লোকধর্মের কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকে না, অন্যদিকে শাস্ত্রীয় বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত রয়েছে। লোকধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে যায় সেটি হলো লোকধর্ম কিভাবে সমাজ ব্যবস্থায় তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে? লোকধর্ম ও তার আনুষাঙ্গিক পূজা-পার্বণ, দেব-দেবী, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ গুলি শাস্ত্রীয় ধর্ম যাকিনা রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত সেই রাষ্ট্রীয় ধর্মের অনুসরণকারীরা তাদের বিচিত্র কামনা-বাসনা পূরণের মধ্যে লোকধর্মের আনুষাঙ্গিক পূজা-পার্বণ ও আচার-আচরণ গুলি সম্পৃক্ত ও সমাদৃত রয়েছে। লোকধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রতীকধর্মিতা এবং সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর আস্থা প্রকাশ। প্রতীক ধর্মিতা ও সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পবিত্র বিশ্বাস যেমন সম্পৃক্ত রয়েছে তেমনি মানুষ তার জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য বহুবিধ ও বিচিত্র সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নিজের সত্তার বাইরে কল্পিত কিংবা পার্থিব সত্তার ওপর আনুগত্য প্রকাশ করেছে, এই আনুগত্যের মধ্যেই লোকধর্মের বিচিত্র ভাবনা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ সম্পৃক্ত রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকধর্মের প্রকৃতি ও স্বরূপ এই জেলার বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ বিষয় যেমন কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিচর্যা, প্রজনন ভাবনা, যৌনতা ও উর্বরতা, রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার সুপ্ত বাসনা, গ্রাম ও সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা, গবাদি পশু ও বন্য জীবজন্তুর মঙ্গলকামনা, প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর গভীর আনুগত্য প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় লৌকিক ব্রতপালন, লৌকিক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও লোকউৎসব পালনের মধ্যে।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের প্রচলিত আচার-আচরণ: মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের প্রচলিত আচার-আচরণ গুলি লৌকিক ব্রত পালন, লৌকিক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-অর্চনা এবং বিভিন্ন ধরনের লোকউৎসব পালনের মধ্যে সম্পৃক্ত রয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯), বাংলার ব্রত শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই ব্রত বলে। তিনি ব্রত গুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন মেয়েলী ব্রত ও শাস্ত্রীয় ব্রত। মেয়েলী ব্রতকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন নারী ব্রত ও কুমারী ব্রত। তিনি মনে করেন মানুষের কামনা ও বাসনার জন্য ব্রত অনুষ্ঠান পালন করা হলেও সেই কামনা-বাসনা ব্যক্তির জন্য নয় বরং জনগোষ্ঠীর জন্য সমাজের জন্য সমষ্টির জন্য। তিনি শাস্ত্রীয় ব্রতকে শ্রেণী সমাজের পরিচায়ক বলে মনে করেছেন এবং শাস্ত্রীয় ব্রত পালনে সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা প্রাধান্য পায়,

অন্যদিকে প্রকৃত ব্রত যাকে তিনি লৌকিক ব্রত বলে মনে করেন সেই লৌকিক ব্রত শ্রেণী সমাজের পূর্বে গড়ে উঠেছিল এবং সম্প্রদায় কেন্দ্রিক চেতনার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মহিলারা সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের ব্রত পালন করে থাকেন। ভাঁজো ও ইতুব্রত মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষিকেন্দ্রিক ব্রত পালন গুলির মধ্যে অন্যতম। মুর্শিদাবাদ জেলার বরঞ্চ ব্লকের আন্দি গ্রামের মহিলারা ভাদ্র মাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ করে শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত ভাঁজো ব্রত পালন করে থাকেন। ষষ্ঠীর আগের দিন পঞ্চমীতে পাঁচ রকমের শস্য মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা একটি পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরের দিন ষষ্ঠী পূজায় সেগুলি কিছুটা নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বাকিটা ইঁদুরের মাটি একটি মাটির সরাতে ছড়িয়ে ওই দানা শস্য গুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং দ্বাদশী পর্যন্ত মহিলারা প্রতিদিন স্নান করে সামান্য জল ছিটিয়ে দেয়। কয়েকদিন পর যখন দানাশস্য গুলি অঙ্কুরিত হয় তখন বোঝা যায় সেই বীজ দিয়ে চাষ করলে সে বছর প্রচুর ফসল ফলবে।

চিত্র নং- ১ ও ২, ভাঁজো ব্রত পালনের অঙ্কুরিত শস্যের সরাকে নদীতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও ইতব্রত পালনের ঘটে বিভিন্ন ধরনের শাক ও আগাছার উপস্থিতি।

বীজের অঙ্কুরোদগমের আনন্দে মহিলারা শস্য উৎসবের আয়োজন করেন। গোবর জল দিয়ে লিকানো বেদীর উপর ইন্দ্রের ব্রজচিহ্ন যুক্ত আলপনা দিয়ে মেয়েরা বেদির চারিদিকে গোল করে দাঁড়িয়ে ভাঁজোর জাগরণপর্ব পালন করেন নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে। অঙ্কুরিত মাটির পাত্রটিকে শেষে পুকুর কিংবা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাঁজো ব্রত পালনের লৌকিক আচার-আচরণ কৃষি কেন্দ্রিকতার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যা বীজরোপন ও ভালো ফসল পাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা এই ব্রত পালনের আকৃতিম আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঁজো ব্রত পালনের সাথে ইতুব্রত পালনের একটি সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায় সেটি হল ইতুব্রত কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। ইতুব্রত পালনেও মাটির সরাতে রবিশস্যের দানা জাতীয় শস্য মাটির সরাতে অঙ্কুরোদগমের জন্য মাটি দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যে ঘট স্থাপন করা হয় তাতে সাত ধরনের লতাপতা বা ঘাস জাতীয় আগাছা রাখার রীতি রয়েছে, এই ঘাস গুচ্ছের উপস্থিতির কারণ হলো যাতে ফসলের জমিতে আগাছা না জন্মায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় অবাঙালি সংস্কৃতির প্রকৃতি পূজা ও প্রজনন ভাবনার মতো ঐতিহ্যবাহী লৌকিক আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যায় ছটব্রত পালনের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষত কর্মসূত্রে বেশ কিছু মানুষ বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ, লালবাগ ও বহরমপুরের বেশ কিছু জায়গায় বসবাস করে। তারা প্রতিবছর ছটব্রত ভাগীরথী নদীর তীরে পালন করে থাকেন। ছটব্রত পালনের লৌকিক আচার-আচরণ পালনের মধ্যে মরশুমি ফল যেগুলি খুব বেশি পরিমাণে ফলে সেই সমস্ত ফলগুলি গোটা-গোটা নৈবেদ্য হিসেবে ছটি মাইয়ার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়।

চিত্র নং-৩ ও ৪, ছটব্রত ও অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালনে মরশুমী বিভিন্ন ফল অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ এবং প্রকৃতি ও বৃক্ষ পূজার নিদর্শন।

আবার ছটব্রত পালনের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। ছটব্রত পালনে অস্তগামী সূর্যকে ষষ্ঠী তিথীতে এবং উদীয়মান সূর্যকে সপ্তমীতে বন্দনা করা হয়। কোন মূর্তিপূজা নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের পূজা, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পূজা। ছটব্রত পালনের সাথে বাঙালি সংস্কৃতির ষষ্ঠী ব্রত পালনের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালনে ছটব্রত পালনের ন্যায় মরশুমী যে সমস্ত ফলগুলি অধিক পরিমাণে ফলে সেগুলি অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করা হয়। অর্থাৎ মা ষষ্ঠীর কৃপায় কেউ যেন সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত না হয়, ছটব্রত তার ব্যতিক্রম নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় শীতলা ষষ্ঠীব্রত পালন করা হয় মাঘ মাসের সরস্বতী পূজার পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে। শীতলা ষষ্ঠী ব্রত পালনে মুর্শিদাবাদ জেলায় গোটা কলাই এর সাথে সাত ধরনের গোটা ফল সেদ্ধ খাওয়ার ঐতিহ্যবাহী রীতির প্রচলন রয়েছে। কেবলমাত্র ব্রতিনীরা এই খাবার খান না বাড়ির সকল সদস্য সেই একি খাবার খেয়ে থাকেন, সেই দিন উনুন জলে না উনুন ও শিলনোড়াকেও পূজা করা হয়। শীতলা ষষ্ঠী ব্রত পালনে শীতল বা পান্তা খাওয়ার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা ঋতু পরিবর্তনের সাথে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী। কেননা শীতের অবসানে ও বসন্তের শুরুতে তীব্র দাবাদাহের সাথে শীতল খাবার ঋতু পরিবর্তনের সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমবারুনি ব্রত পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাচার হল গঙ্গাস্নান ও গোটাআম বোটা সমেত মা গঙ্গাকে অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করা। গোটা আম বোটা সমেত মা গঙ্গাকে অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করার মধ্যে দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রতিয়মান হয় সেটি হল আমবারুনি ব্রত পালন করে তারপর আম খাওয়ার মৌখিক ও নৈতিক ছাড়পত্র পাওয়া যায়। অর্থাৎ আম যতদিন না খাওয়ার উপযোগী হচ্ছে ততদিন খাওয়া যাবে না।

মুর্শিদাবাদ জেলায় শিবের লৌকিকতার নানান বৈচিত্র নীলষষ্ঠী ব্রত পালনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নীল পূজা। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন মহিলারা গাজন তলার শিবির মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফল, বেলপাতা সহকারে শিব জ্ঞানে নীলের পূজা করে থাকেন। নীলষষ্ঠী ব্রত পালনের উপাচার হিসেবে এক জোড়া আম্র ফলের সঙ্গে মাটির একটি প্রদীপ বা মোমবাতি থাকে, নিয়ম হলো সেই প্রদীপ বা মোমবাতি গাজন তলার প্রদীপ থেকে জেলে নিয়ে সেই দীপ শিখায় ব্রতিনীরা সেদিন নিজেদের বাড়ির সন্ধার প্রদীপ জালিয়ে থাকেন। প্রদীপ জালানোর এই রীতির উদ্দেশ্য হলো প্রদীপের শিখার তাপে তাদের সন্তান সর্বদা রোগমুক্ত থাকবে এবং দীর্ঘায়ু হবে, আবার বন্ধ্যা নারী হবেন পুত্রবতী। ছাতু সংক্রান্তি ব্রত পালনে উপবাস থাকা, নিরামিষ আহারের সাথে ছাতু খাওয়া, ভাইছাতু অর্থাৎ বোনেরা ভাইয়ের হাতে ছাতু মাখা তুলে দেয়। ভাইছাতু ভাই ও বোনের আকৃতিম সম্পর্ককে আরো মজবুত করে। ছাতু সংক্রান্তি ব্রত পালনের দিন 'তুলসীঝরা' বাঁধা হয়। অর্থাৎ বাড়ির সবথেকে পবিত্র গাছ তুলসী গাছের উপর দুই পাশে দুটি বাঁশের কঞ্চি পুতে মাঝ বরাবর আরেকটি কঞ্চি বেঁধে তাতে একটি মাটির কলসি ফুটো করে বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিদিন স্নান করে সেই কলসিতে জল ঢেলে দেওয়া হয় এবং কলসির ফুটো দিয়ে বিন্দু-বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে এতে গ্রীষ্মের তীব্র দাবাদহের হাত থেকে তুলসী গাছটি রেহাই পায় এবং সতেজ থাকে যা বৃক্ষপ্রেম ও প্রকৃতি প্রেমের নিদর্শনকেও তুলে ধরে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মহিলারা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অশোক ষষ্ঠী ব্রত পালন করে থাকেন। আশোক ষষ্ঠী ব্রত পালনে ব্রতিনীরা অশোক ফুলের কুঁড়ি দই মাখিয়ে খেয়ে থাকেন। অশোক ফুলের ঔষধি গুণ মহিলাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যা বাৎসরিক টিকাকরনও বলা যেতে পারে। অশোক ফুলের কুড়িতে প্রাকৃতিক হাইট্রোইস্ট্রজেনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা ঔষুধি গুনমান সম্পন্নতাকে নির্দেশ করে। মুর্শিদাবাদ জেলায় মঙ্গলচন্ডী ব্রত প্রায় সমস্ত অঞ্চলে সধোবা কিংবা বিধবা মহিলারা সমগ্র বৈশাখ মাসের প্রতিটি মঙ্গলবার বাড়িতে ও গ্রামের মন্দিরে দলবদ্ধভাবে পালন করে থাকেন। মঙ্গলচন্ডী ব্রত পালনে ভাঁজো এবং ইতু ব্রত পালনের মত মাটির সরাতে দানা জাতীয় শস্যকে অঙ্কুরোদগমের জন্য ছড়ানোর রীতি এই জেলায় লক্ষ্য করা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার সবথেকে জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত ষষ্ঠী ব্রত গুলির মধ্যে অরণ্যষষ্ঠী অন্যতম, অরণ্যষষ্ঠী জামাইষষ্ঠী নামেও পরিচিত। অরণ্যষষ্ঠী পালন করা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। লোক ভাবনায় দেবী ষষ্ঠী উর্বরতা ও প্রজনন ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয় সাধারণত কোন বৃক্ষের তলায় যে বৃক্ষটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বট, অশ্বত্থ, নীম কিংবা খেজুর গাছ হয়ে থাকে। অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত পালনে নববিবাহিত দম্পতি কিংবা প্রথম সন্তানের জননী বিশেষত বাবার বাড়ি এসে সন্তান কামনা এবং সন্তানের জীবনের দীর্ঘায়ু কামনায় চালুন কিংবা ডালা দিয়ে থাকেন। অরণ্য ষষ্ঠী ব্রত পালনে গোটা-গোটা মরশুমি ফল যেগুলি অধিক মাত্রায় ফলে সেগুলি ষষ্ঠী দেবীকে অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করা হয়, যা প্রজনন ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। আবার ষষ্ঠী ব্রত পালনে বৃক্ষপূজার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ষষ্ঠী ব্রত যে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত তা অস্বীকার করা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলায় আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার ও শনিবারের তৃতীয় তিথি থেকে নবমী তিথির মধ্যে যেকোনো তিথিতে বিপত্তারিনী ব্রত পালন করে থাকেন গ্রাম বাংলার অসংখ্য মহিলারা। বিপত্তারিণী দেবীকে মা দুর্গার একটি রূপ হিসেবে

বিবেচনা করা হয়। বিপত্তারিণী ব্রত পালনে লাল সুতোকে তেরোটি ঘাট বেঁধে ছেলেদের ডান হাতে এবং মেয়েদের বাম হাতে বাঁধার রীতি রয়েছে, এই লাল সুতো হাতে বাঁধার প্রতিকী অর্থ হলো এই সুতো মা বিপত্তারিনীর আশীর্বাদ সমৃদ্ধ, যা ধারন করলে বিপদ বা সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস ব্রতিনীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

।।২।।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিচিত্র লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা সারাবছর ধরে চলতে থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অন্তর্গত ধুলাউড়ি গ্রামে পুরনো এক বট বৃক্ষের তলায় লোকদেবতা বাবা মস্তরামের আশ্রম রয়েছে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এবং দোল পূর্ণিমা ও পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে মেলা বসে। মেলায় বাউল, দরবেশ, বৈষ্ণব, সুফি সম্প্রদায়ের সাধক গণের আগমন হয়। বাবা মস্তরামের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের রীতি হিসেবে আগত ভক্তরা মানসিক হিসেবে বাড়ির গাছের ফল ও দুধ মস্তরামের থানে অর্পণ করে থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকদেবতা হিসেবে ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ চর্ম রোগের দেবতা হিসেবে পূজিত হয়। পূজার লৌকিক আচর-আচরনের মধ্যে মুড়ি ভাজার খোলার উপর গোবরের মূর্তি তৈরি করে, ভাটফুল, সিদ্ধচাল ও মুসুরির ডাল দিয়ে ঘেঁটুপূজা করা হয়। ঘেঁটুপূজা বাড়িতে করা হয় না, বাড়ি থেকে বাইরে চৌরাস্তার ধারে করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকদেবতা হিসেবে বেলডাঙা থানার মানিকনগর গ্রামের আদম ও গাদমদেব অত্যধিক জনপ্রিয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা আদম ও গাদমদেবের প্রতীক হিসেবে দুটি বিরাট কাঠের খন্ড পূজিত হয়। আদম ও গাদমদেবের পূজার লৌকিক রীতি হিসেবে দুধ-গঙ্গা জল অর্পণ এবং মানসিক পূজার প্রচলন রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকদেবী হিসেবে মনসা, শীতলা, চন্ডী, ষষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে সারা বছর ব্যাপী পূজিত হয়। লোকদেবী মনসা এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্পূর্ণ আবোক্ষমূর্তি তৈরি করে, কোথাও পাথরের প্রতীক, সীজ মনসা গাছের কিংবা ঘট পূজার মধ্য দিয়ে সারাবছর ধরে পূজা-অর্চনা চলতে থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার খুব জনপ্রিয় মনসা মন্দির হিসেবে কান্দি থানার অন্তর্গত পার্বতীপুরের মনসা মন্দির, ঝিকিরহাটি গ্রামের মনসা মন্দির পরিচিত। মনসা পূজার একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি হলো মনসামঙ্গল গান। মনসা দেবীর পূজা-অর্চনায় অনেক স্থানে ঘট বা সরা পূজার প্রচলন রয়েছে। ঘট বা সরাতে পটুয়ারা যে পটচিত্র অঙ্কন করেন সেখানে মনসা দেবীর যে অবয়ব তুলে ধরা হয় সেখানে মনসা দেবী গর্ভবতী, যা উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্ম ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। মনসা পূজোয় দশকর্মার দোকানে শোলা দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের পুতুলের ন্যায় 'করোন্ডি' বিক্রি হয় এই করোন্ডি মনসা দেবীর প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। প্রকৃতপক্ষে করোন্ডি স্ত্রী অঙ্গের ধারনার সাথে সম্পর্কিত যা মনসাকে প্রজনন ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত করে। মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্রই মনসা দেবীর পূজা-অর্চনায় ব্রাহ্মণ্যকরণের রীতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণের উপস্থিতি ও মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মনসা পূজা সম্পন্ন হয়। পারিবারিক উদ্যোগে মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে, যে বাড়িতে মনসা পূজা হয় সেই বাড়িতে একটি সীজ মনসা গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, গাছটি মনসা দেবীর প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়।

চিত্র নং-৫ ও ৬, সীজ মনসা গাছের প্রতীকে মনসা পূজা ও শীতলা পূজার দণ্ডীকাটা।

লোকদেবী হিসেবে শীতলা মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বট, অশ্বত্থ, নীম গাছের তলায় শীতলা দেবীর মন্দির অহরহ লক্ষ্য করা যায়, শীতলা দেবী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবেই পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন শীতলা পীঠ গুলির মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুরের শীতলা পীঠ, কান্দি থানার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামের শীতলা পীঠ এবং বহরমপুর থানার বাসুদেবখালীর আধার মানিক গ্রামের শীতলা পীঠে প্রাচীন শীলাখন্ডে শীতলা দেবীর আরাধনা করা হয়। শীতলা দেবী বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পুজিত হন। আজও গ্রাম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসন্ত রোগ হলে 'মায়েরদয়া' হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং তার সুস্থতার জন্য শীতলা মন্দির থেকে চরণামৃত নিয়ে এসে খাওয়ানো এবং সাতদিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার বিধান রয়েছে। শীতলা পূজার লৌকিক আচর-আচরন হিসেবে দণ্ডীকাটা, ঢেলাবাধা এবং শীতলা পুজোর ঘট গ্রামের সীমান্তে পুঁতে দেওয়ার নিদর্শন রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল বসন্ত রোগ যেন গ্রামে প্রবেশ না করতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকদেবী ষষ্ঠীর আরাধনা ব্রতকেন্দ্রিক ষষ্ঠী দেবীর থান সাধারণত বাড়ির বাইরে বট, অশ্বত্থ, নীম কিংবা খেজুর গাছের তলায় হয়ে থাকে এবং সেই গাছের নিচে সুন্দর করে বাধানো থাকে। ষষ্ঠী দেবীর পূজা-অর্চনার লৌকিক আচার-আচরণ পালনের সাথে সন্তান প্রজনন, প্রতিপালন এবং দীর্ঘ জীবনের বাসনা সম্পৃক্ত রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ষষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্রত গুলির মধ্যে অরণ্যষষ্ঠী ব্রত সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং এই জেলার সমস্ত জায়গায় অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয়। অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালনের লৌকিক রীতি হিসেবে মরশুমি বিভিন্ন ফল যেগুলি অধিক পরিমাণে ফলে সেগুলি ষষ্ঠী দেবীকে অর্ঘ্য হিসেবে অর্পণ করা হয় যার সাথে প্রজনন ভাবনার সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। অশোকষষ্ঠী ব্রত পালনে অশোক ফুলের কুঁড়ি খাওয়ার প্রচলন রয়েছে আবার নীলষষ্ঠী ব্রত পালনে গাজন তলার প্রজ্জলিত প্রদীপ থেকে আগুন নিয়ে ব্রত পালনকারী মহিলারা নিজেদের বাড়িতে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকেন, এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরনের ষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয় যেমন কোঁড়াষষ্ঠী, লোটনষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকিক শাক্ত দেবীর মধ্যে চণ্ডী প্রাচীনতম এবং এই জেলায় চন্ডী দেবীর আরাধনা মূলত প্রাচীন শিলাখণ্ডে, মূর্তি কল্পনায় এবং ব্রতকেন্দ্রিক পূজা-অর্চনার প্রচলন রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জনপ্রিয় চন্ডীপীঠ গুলির মধ্যে মাসলা গ্রামের মঙ্গলচন্ডী মন্দিরে ডিম্বাকৃতির দুটি প্রাচীন শিলাখন্ড চন্ডী দেবীর প্রতীকে পূজিত হয়। রাঢ় মুর্শিদাবাদের জজান গ্রামের সর্বমঙ্গলাদেবী চণ্ডীরূপে পূজিত হয় এবং চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবে ভক্তরা দেবীকে স্নান

করান এবং বেতের শেকলের মধ্য দিয়ে সারা গ্রাম প্রদীক্ষন করান। বরঞ্চা থানার অন্তর্গত সাহোড়া গ্রামের দেবী চণ্ডী সংকটেশ্বরী নামে পরিচিত। কান্দি থানার অন্তর্গত দোহালিয়ায় দেবি চণ্ডী দখিনা কালীন নামে পরিচিত। দেবী চণ্ডীর পূজা- অর্চনার লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে বলিদান, প্রাচীন শিলাখণ্ডের জলাভিষেক, গ্রাম প্রদীক্ষণ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। আবার মঙ্গলচন্ডী ব্রত পালনে মাটির সরাতে দানা জাতীয় শস্যের অঙ্কুরোদগমের দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার অন্তর্গত নওপুকুরিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে নিত্য পূজিত হন মা ডুমিনি, ডুমিনি মায়ের পূজা- অর্চনার রীতি হিসেবে মানসিক, অর্ঘ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফল, ফুল অর্পণ, ঢাকি সমেত মায়ের গুণগান করতে করতে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং বৃক্ষপূজার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকদেবতা হিসেবে ধর্মরাজ অত্যন্ত জনপ্রিয়, ধর্মরাজের প্রতীক হিসেবে কচ্ছপ আকৃতির পাথরখন্ড, কাঠ ও মাটির ঘোড়া, ত্রিশূল এবং মাটির ছোট-ছোট অসংখ্য ঘট পূজিত হয়। ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা-অর্চনায় লৌকিক আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় গাজন উৎসবে।

চিত্র নং-৭ ও ৮, ধর্মরাজের গজনে ভাঁড়ালনাচ ও আগুনঝাঁপ।

মুর্শিদাবাদ জেলার গাজন উৎসব বিশেষত শিব এবং ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি, খড়গ্রাম, ভরতপু, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজা- অর্চনা ও গাজন উৎসব পালিত হয়। ধর্মরাজের গাজনে লৌকিক আচার-আচরণের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত গুলি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো ভাড়ালনাচ- ধর্মরাজের ভক্তরা একটি মাটির ভাড় বা হাঁড়িতে নদী থেকে জল, ফুল, মধু ইত্যাদি ভরে বিশেষ ভঙ্গিমায় মাথা নাড়তে-নাটতে মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে যাত্রা করে। ধর্মরাজের গাজনে দৈহিক কৃচ্ছুসাধনের দৃষ্টান্তও লক্ষ্য করা যায় যেমন দন্ডিকাটা, ভক্তখাটা, মুখোশনাচ, চোরাজাগরণ, আগুনঝাঁপ, কাটাঝাঁপ ইত্যাদি।

॥ ৩ ॥

মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষিকেন্দ্রিক লোকউৎসব গুলির মধ্যে নবান্ন ও পৌষ পার্বণ অত্যধিক জনপ্রিয়। নবান্ন হলো নতুন ধান বা অন্নের উৎসব, অঘ্রাণ মাসের কোন এক শুভদিনে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়। নবান্ন উৎসবের লৌকিক আচার-আচরণ গুলির মধ্যে 'মুটআনা' অন্যতম। কার্তিক সংক্রান্তির ভোর বেলায় সূচিবস্ত্র পরিধান করে কাস্তে আর মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে আমন ধানের জমির ঈশান কোণ থেকে আড়াই আলুই ধান

কেটে কলা বউয়ের মত কাপড়ে জড়িয়ে মাথায় করে নিয়ে আসা হয়, এছাড়া নতুন ধানের আতপ চালকে বেটে আলপনা দেওয়া এবং 'কাকনবান' পর্ব অর্থাৎ নতুন ধানের আতপ চাল বেটে তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ফল মিশিয়ে বিশেষ এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি করা হয়, এই মিশ্রণ কলা পাতায় করে পশু-পাখি, পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় একে কাকনবান বলে। বাঙালির কৃষি সংস্কৃতির লোক উৎসব ও আচার-আচরণের মধ্যে পৌষ পার্বণ জনপ্রিয় লোক উৎসব। বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তির দিন নতুন ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয়। পৌষ পার্বণের দিন নতুন ধানের আতপ চাল বেটে তুলসী তলায় আলপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কৃষি যন্ত্রপাতির ছবি আঁকা হয়। পৌষ পার্বণের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকাচার হল আউরি, বাউরি তৈরি করা। কার্তিক সংক্রান্তির মুটআনা ধানের শীর্ষসহ সামান্য খড়কে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে বিশেষ কায়দায় বেঁধে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বেঁধে দেওয়া হয়। এছাড়া পৌষ আগলানো এবং নতুন চাল বেঁটে বিভিন্ন ধরনের পিঠে, পুলি তৈরি করে খাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

চিত্র নং- ৯ ও ১০, পৌষ পার্বণে নতুন ধানের আতপ চাল বেটে আলপনায় কৃষি যন্ত্রপাতি ও জাহের থানে বাহা পরবের পূজা-অর্চনা।

মুর্শিদাবাদ জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে বাহা পরবের প্রচলন রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল, মালপাহাড়ি, ওঁরাও, ভূমিজ, লোধা, মাহালি, মুন্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে, তবে সংখ্যাধিক্যের বিচারে সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাহা পরব মূলত ফুলের উৎসব এবং এই উৎসবের উদ্দেশ্য হলো সাঁওতালদের নিজস্ব দেবতাদের পূজার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা, যাতে তাদের আশীর্বাদে গ্রামের সকল মানুষ ও গবাদি পশুরা রোগমুক্ত থাকতে পারে। গ্রামের 'জাহের' থানে সাঁওতালদের মধ্য থেকেই একজনকে পুরোহিত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যাদের 'নায়েক' বলা হয়। পুজো শেষে একটি করে শাল কিংবা মহুয়া ফুল গ্রামের প্রত্যেকের বাড়িতে পাঠানো হয় এবং সাঁওতাল মহিলারা যতদিন না বাহা পরব হয় ততদিন পর্যন্ত নিজেদের চুলের খোপায় এই ফুল ধারণা করেনা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় লোক উৎসবগুলির মধ্যে চড়ক বা গাজন উৎসব এই জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। শিবের গাজন সাধারণত চৈত্র মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হয়, তবে চৈত্র মাস ছাড়াও মাঘ মাসেও এই জেলার লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রামে গাজন উৎসব পালিত হয়। প্রসাদপুর গ্রামের গাজন উৎসবের লৌকিক রীতি হিসেবে শিবগোত্র ধারণ, উপবাস, গ্রাম প্রদীক্ষণ, ঢাকের তালে ভক্তখাটা, ঘটভরা, হাজরা নিমন্ত্রণ ও গভীর রাত্রে বিশেষ ভোগ নিবেদন, ধানবোনা ইত্যাদি লৌকিক আচার-আচরণ গুলি লক্ষ্য

করা যায়, তবে দৈহিক কৃচ্ছসাধনের দৃষ্টান্ত এই গাজন উৎসবে লক্ষ্য করা যায় না। চৈত্র মাসের শেষে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি থানার বিভিন্ন স্থানে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের গাজন উৎসবে পালিত লোকিক আচার-আচরণ গুলির মধ্যে অন্যতম হলো শিবগোত্র ধারান, উপবাস ও সংযমী দিন যাপন, নীল পাঠের প্রাত্যহিক পূজা, হাজরানাচ- গাজনের সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতীকে মুখোশ পরে নৃত্য প্রদর্শন করে, হাজিরা নিমন্ত্রণ- মূল সন্ন্যাসী হাজরা তলায় গিয়ে পান, সুপারি, বাতাসা দিয়ে হাজরাকে নিমন্ত্রণ করে আসেন, হাজরাপূজা- হাজরা পূজায় হাজরা কে এক বিশেষ ধরনের ভোগ নিবেদন করা হয়, এই ভোগ মূল সন্ন্যাসী একটি মাটির পাত্রে চাল-ডাল সহকারে বিশেষ ভোগ প্রস্তুত করেন এবং তার সাথে শোল মাছ পুড়িয়ে ভোগের ওপর দিয়ে হাজরাকে ভোগ নিবেদন করেন।

চিত্র নং-১১ ও ১২, গাজন উৎসবের হাজরানাচ ও শরীরে বংশী গেথে চড়ক গাছে ঘোরা।

শ্মশানচালনা- ভক্তরা শ্মশানে গিয়ে পৈশাচিক নৃত্য প্রদর্শন করে, তাছাড়া দৈহিক কৃচ্ছসাধনের অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যেমন কাটাভাঙ্গা, বানফোড়া, আগুনলাফ, শরীরের কোন অংশে বংশী গেঁথে চড়ক গাছে ঘোরার মতো নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

রাঢ় মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় গাজন উৎসব হল কান্দি থানার অন্তর্গত রুদ্রদেবের বাৎসরিক হোম বা গাজন উৎসব। রুদ্রদেবের প্রাচীন শিলা মুর্তিটি বৌদ্ধ মূর্তি, বৌদ্ধ মূর্তি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পূজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রুদ্রদে কে কেন্দ্র করে লক্ষ্য করা যায়। রুদ্রদেবের হোম উৎসবে যারা ভক্ত বা সন্ন্যাসী হয় তাদের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা যায় যেমন কালিকাপাতার সন্ন্যাসী- এরা পিশাচ বেশে পচাগলা মৃতদেহ ও নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করে, মায়েরপাতার ভক্ত- এরা ডাকিনি বেসে নৃত্য করে, ধুলাসেনপাতার ভক্ত- এরা ধুলোতে গড়াগড়ি যায় এবং ধুলো ছড়িয়ে উগ্র নৃত্য করে, জলকুমিরপাতার ভক্ত- এরা রান্নাকরা খিচুড়ি ভোগ জলে নিয়ে গিয়ে ছিটিয়ে নৃত্য করে, চামুণ্ডাপাতার ভক্ত- এরা জাগরনের রাত্রে মুখোশ পরে নৃত্য করে, লাউসেনপাতার ভক্ত এরা লাউ ও কুমড়ো নিয়ে নৃত্য করে, ব্রহ্মাপাতার ভক্ত- এরা আগুন জ্বালিয়ে নৃত্য করে, দিয়াসিনীপাতার ভক্ত- এরা নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য করে। রুদ্রদেবের গাজন উৎসবের লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে মধুভাঙ্গা অনুষ্ঠান, কাটাভাঙ্গা অনুষ্ঠান, সিদ্ধিভাঙ্গা অনুষ্ঠান, চোরাজাগরন, ভক্তখাটা, দাদুরঘাটা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র নং ১৩ ও ১৪, রুদ্র দেবের গাজন উৎসবে নরমুন্ড নিয়ে নৃত্য ও সিদ্ধিভাঙ্গা অনুষ্ঠান।

পদ্ধতি ও কৌশল: গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির প্রকৃতি গুণগত প্রকৃতির, যেখানে প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক নানাবিধ বিষয়গুলির গুণাত্মক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে গৌণ উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের গুণাত্মক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত তথ্যগুলিকে বর্তমান সমাজ কাঠামোর সাথে ব্যক্তি-মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার যে অসংখ্য বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, সেই বৈচিত্র্য সমাজ জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, বিশেষত তথ্যচিত্র উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, চলভাসের সাহায্যে তথ্যচিত্র ধারণ, ভিডিও রেকর্ডিং এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য নোটবুক ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে গৌণ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য নেয়া হয়েছে যেগুলি অফলাইন ও অনলাইন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

লোকোধর্মের আচার-আচরণের ব্যবহারিক উপযোগিতার সামাজিক তাৎপর্য: লোকধর্মের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার মধ্যে সমগ্র রূপ ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি ঘটে না, লোকধর্মের সাথে সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, পার্বণ সমস্ত কিছু নিয়েই পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়। লোকধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও পার্বণের সামাজিক তাৎপর্য তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের থেকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক। লোকধর্মের আচার-আচরণ পালনের সাথে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার বিন্যাস সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার সাহায্যে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়, এই প্রকৃত রূপ তাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিবারিক কাঠামো, আত্মীয়তার সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

লোকধর্মের আচার-আচরণের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। লোকধর্মের আচার-আচরণ পালনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ গুলির উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার সাথে অসংখ্য মানুষের জীবিকা নির্বাহের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তেমনি আবার লোকধর্মের বিশেষ আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ উপকরণ গুলি স্থানীয় বাজারের বেচাকেনাকেও যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সেই উপকরণের উপস্থিতির উপর তার দামেরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। লোকধর্মের আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কিত উপকরণের মধ্যে মাটির প্রদীপ, মাটি ও কাঠের ঘোড়া, বিশেষ রঙের পরিধানের জন্য বস্ত্র, বেতের লাঠি, দশকর্মার দোকানের বিভিন্ন উপকরণ, মিষ্টি, দুধ, ঘী, সিঁদুর,

মোমবাতি, বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফল ইত্যাদি উপকরণ গুলির উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সমাজ জীবনের অসংখ্য মানুষের জীবিকা ও তার অর্থনৈতিক উপযোগিতাকে অস্বীকার করা যায় না। লোকধর্মের আচার-আচরণের সাথে উৎপাদন বন্টন ও অর্থনৈতিক উপযোগিতার পাশাপাশি সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে উৎপাদন কর্মের সাথে সম্পর্কিত কারিগর, কৃষি ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত থাকা ব্যক্তিদের উৎপাদন কর্মে উৎসাহ প্রদান করে থাকে, যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল থাকে। লোকধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও লোকউৎসব কে কেন্দ্র করে যে মেলার আয়োজন হয় সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর বেচাকেনা হয় এবং ছোট বড় সকলের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক পরিষেবা বিদ্যমান থাকে। ফলে লোকউৎসব ও মেলার সাথে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উপযোগিতার প্রসঙ্গ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

লোকধর্মের আচার-আচরণের সামাজিক তাৎপর্যের সাথে মানুষের ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল জীবনে সকলের সাথে মিলিত হওয়া ও দীর্ঘ সময় কাটানোর অবসর প্রদান করে যার ফলে একে অপরের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া যেমন বাড়ে তেমনি লোকধর্মের আচার-আচরণ গুলি গ্রাম, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কেন্দ্রিক হওয়ায় অসংখ্য মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আচার-অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত জীবনে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি মজবুত হয়। লোকধর্মের আচার-আচরণ পালনের মধ্যে ট্যাবুর (Tabu) ধারণা সম্পৃক্ত রয়েছে। ট্যাবু হলো এমন বিশ্বাস যার সাথে পরিহার বা বর্জনের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ লোকধর্মের পবিত্র বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত যে মূল্যবোধ বিদ্যমান রয়েছে তার পরিপন্থী নয় এমন ধারণা ও ক্রিয়াকর্মকে সর্বদা এড়িয়ে চলা হয় যেমন লৌকিক বিভিবন্ন ব্রত পালন কিংবা বিভিন্ন দেব-দেবীর থান যে বৃক্ষের নিচে হয়ে থাকে সেই বৃক্ষের প্রতি পবিত্র বিশ্বাস সম্পৃক্ত রয়েছে তাই সেই বৃক্ষের ক্ষতিকারক চিন্তা ও কর্ম উভয় থেকেই মানুষ সর্বদা বিরত থাকার চেষ্টা করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি লোকধর্মের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও তার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী। প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান যেমন জল, বাতাস, আগুন ,পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি সকলের সাথে লোকধর্মের পবিত্র বিশ্বাস সম্পৃক্ত রয়েছে, যার ফলে এগুলি সংরক্ষণের ওপর লোকধর্মের অনুসরণকারীরা সর্বদা তৎপর থাকে। বসন্ত রোগের সাথে শীতলা দেবীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই আজও গ্রামগঞ্জে কারো শরীরে বসন্ত রোগ হলে 'মায়েরদয়া' হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং সাত দিন নিরামিষ খাওয়া ও ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রচলিত রয়েছে, এই বিধিনিষিদের সাথে সামাজিক শরীরের প্রসঙ্গ উঠে আসে, কেননা বসন্ত রোগ ছোঁয়াচে প্রকৃতির তাই কারো শরীরে বসন্ত রোগ হলে সে সব জায়গায় ঘুরে না বেড়িয়ে নিজেকে সকলের থেকে পৃথক রাখে, কারণ তার শরীর থেকে বসন্ত রোগের ভাইরাস অন্যের শরীরে যেন না ছড়িয়ে পড়ে। তাই নিজেকে আবদ্ধ করার মধ্যে সামাজিক শরীরের ভালো থাকার প্রসঙ্গটি জুড়ে রয়েছে। লোকধর্মের বিশ্বাস ও আচার-আচরণের সাথে যে পবিত্র বিশ্বাস সম্পৃক্ত রয়েছে তার সাথে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সার্বিক মঙ্গল কামনা বিদ্যমান থাকায় লোকধর্মের অনুসরণকারীরা সামাজিক জীবন একে অপরের প্রতি সহনশীল থাকার চেষ্টা করে যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণকেও প্রভাবিত করে।

লোকধর্মের আচার-আচরণ পালনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সামাজিক মর্যাদার বিষয়টিও সম্পৃক্ত রয়েছে লোকধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকা এবং শাস্ত্রীয় ধর্মের গোড়ামী এবং নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে

সুউচ্চগরিমার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য মানুষ নিজেদের ধর্মীয় বাসনার অভিব্যক্তি শাস্ত্রীয় ধর্মের আওতায় ঘটাতে পারিনি। যার ফলে লোকধর্মের বিচিত্র আচার-আচরণের সৃষ্টি হয়েছে আর শাস্ত্রীয় ধর্ম লোকধর্ম থেকে সর্বদা ব্যবধান বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেছে এবং এর অনুসারীদের খুব একটা ভালো দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়নি। লোকউৎসব চড়ক বা গাজনের সাথে শিবের প্রেক্ষিতে উঠে আসে, অর্থাৎ চড়ক বা গাজন অনুষ্ঠান হল হর ও গৌরীর বিবাহ কেন্দ্রিক নানান লোকাচার ও দৈহিক কৃচ্ছসাধনের অনুষ্ঠান। চড়ক বা গাজন অনুষ্ঠানের লৌকিক বিভিন্ন আচার-আচরণ যারা পালন করে এবং দৈহিক কৃচ্ছসাধনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত যেমন বানফোড়া, কাটাখেলা, আগুনলাফ, শরীরে বংশী গেঁথে চড়ক গাছে ঘোরা ইত্যাদি আচার-আচরণের সাথে সমাজের নিম্নবর্গ ও নিম্নমুখী সামাজিক সচলতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা বাউরী, বাগদি, ডোম, চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ তারাই আংগ্রহন করে। শিবকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে, নিজেদের মতো করে, তাই দৈহিক কৃচ্ছসাধন শিবের প্রতি তাদের গভীর আনুগত্যকে প্রকাশ করে। আবার মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, চন্ডী ইত্যাদি লৌকিক দেবদেবী লোকবিশ্বাস থেকেই জণমানুষে পুজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত লোকিক দেবদেবীর পূজা-অর্জনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। লৌকিক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার সাথে সামাজিক মর্যাদার প্রসঙ্গ যুক্ত রয়েছে, এই সমস্ত লোকিক দেবদেবীর যারা অনুসারী ও পূজা-অর্চনা করে তারা নিম্নমুখী সামাজিক মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু নিজেদের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের কারণে এই সমস্ত দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কাছে আসার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

চন্ডী মণ্ডপ, শীতলা মণ্ডপ, ষষ্টি তলা গ্রামীণ জীবনে অসংখ্য মানুষের সকাল-বিকাল নিত্য মিলিত হওয়ার স্থান, সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, মতবিনিময় এমনকি গ্রামীণ বহু বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সালিশি সভাও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার চন্ডীতলা, ষষ্ঠীতলা, শীতলা মন্দির পরিচয় বা ঠিকানার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। লোকধর্মের আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কিত ধারণা গুলি বর্তমান সময়ে নতুন করে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন পৌষ পার্বণের পিঠে পুলির ঐতিহ্যবাহী খাবার খাদ্য মেলার বিভিন্ন স্টলে নতুন-নতুন পদ্ধতি ও উপকরণের মোড়কে সাজিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপনা করা হচ্ছে, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রেস্তোরায় জামাইষষ্ঠী স্পেশাল থালির বাহার লক্ষ্য করা যায়। অনলাইন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সম্ভার রয়েছে তারাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ লোকধর্ম ও তার আনুষাঙ্গিক আচার-আচরণ পালনের মাধ্যমে কেবলমাত্র পবিত্র বিশ্বাস, কল্পনা কিংবা মনোবাসনা পূরণের সুপ্ত বাসনা অন্তর্নিহিত রয়েছে এমন নয় বরং সমাজ জীবনে মানুষের সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখে, মানসিক যন্ত্রণা ও একাকীত্ববোধকে প্রশমিত করে এবং মানুষকে বিদ্যমান সামাজিক মানদণ্ডের পরিপন্থী ভাবনা এবং নিজের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটাতেও উৎসাহিত করে।

উপসংহার: লোকধর্ম সমাজের অসংখ্য মানুষের ধর্মীয় ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে বিশেষত যারা শাস্ত্রীয় বা বৈদিক ধর্মে উপেক্ষিত থেকে গেছে। অন্যদিকে লোকধর্মের বিচিত্র ভাবনা, বিশ্বাস ও কল্পনার উপস্থিতি ও উপযোগিতা বৈচিত্র্যপূর্ণ আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। লোকধর্মের আচার-আচরণ কেন্দ্রিক নানাবিধ অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও মেলা বর্তমান সমাজ

ব্যবস্থাতেও পুরনো দায়িত্ব পালন করছে। আর এই দায়িত্ব পালনের মধ্যে সামাজিক সঙ্গবদ্ধতার ধারণা, গোষ্ঠী জীবনের চেতনা ও সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করার মধ্যে সমাদৃত রয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য, বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মানুষের জীবনের বহুমুখী স্রোতের ঘূর্ণবাতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও মানবিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠছে। বেদনা, হতাশা, জীবনধারণের ক্লান্তি যেখানে মানুষকে আষ্টেপিস্টে বেঁধে রেখেছে সেখানে ধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ গুলি মানুষকে সাময়িকভাবে সমস্ত কিছু ভুলে বিপুল জনস্রোতের মাঝে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে, মানবিক সম্পর্ককে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। লোকধর্মের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বর্তমান সমাজ জীবনে তার উপস্থিতি ও প্রভাব টিকিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি আধুনিক সমাজ জীবনের নানাবিধ পন্থা, উপকরণ ও ব্যবস্থাগুলি লোকধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে।

তথ্যসূত্র:

1) ঘোষ, বিনয় (২০২২). পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি. দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ, বিধান সারণি, কলকাতা।
2) চক্রবর্তী, বরুন কুমার (১৯৮৪). লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ।
3) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (১৯৯৮). লোকায়ত দর্শন।
4) ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৯১৯), বাংলার ব্রত।
5) নির্মলানন্দ, স্বামী (১৯৮৭). বারো মাসে তেরো পার্বণ: কি ও কেন, কলকাতা।
6) ভৌমিক, দেবাশীষ (২০২০). বাংলার দেবদেবী ও পূজা পার্বণ পৌরাণিক উৎসব ও লোকভাবনা. পুনশ্চ প্রকাশনী, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কোলকাতা।
7) মুখোপাধ্যায়, সুনীত কুমার (১৯৯৭). মেলা উৎসবের দর্পণে বাংলা লোকসাহিত্য, কলকাতা।
8) মিএ, অশোক (১৯৮৩). পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা।
9) সেনগুপ্ত, পল্লব (২০০১). পূজা পার্বণের উৎসকথা . পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনীয়াটোলা লেন কলকাতা।
10) সিংহ, পুলকেন্দু (২০২০). লোকায়ত মুর্শিদাবাদ. দোসর প্রকাশনী, কলকাতা।
11) Bhatti, H.S (2000). Folk Religion: Change and Continuity. Rawat Publication. Jaipur and New Delhi.
12) Bal, J. Van (1971). Symbols for Communication: An Introduction to the Anthropological Study of Religion, Van Gorcum and Company, The Netherlands.
13) Durkheim, Emile (1995). The Elementary Forms of Religious Life. Trans. By Karen E. Fields. New York, The Free Press.
14) Nicholas, Ralph W. (2003). Fruits of Worship: Practical Religion in Bengal, New Delhi: Chronicle Books.
15) Nicholas, Ralph W. (2016). Thirteen Festivals: A Rituals Year in Bengal. Orient BlackSwan Private Limited, New Delhi.
16) Sardella. Ferdinando and Ruby Sain (2013). The Sociology of Religion in India: Past Present and Future. Abhijeet Publications, New Delhi.
17) Raymond Firth (1971), Routledge, Element of Social Organization.